বাংলা গদ্যশৈলীর বিবর্তন

ভূমিকা : বাংলা সাহিত্যের নানা ধারা বর্তমানে গৃহীত। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে গদ্য একটি। উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা গদ্যের নিদর্শন ছিল না বললেই চলে। সমাজ ও সাহিত্যের বাস্তবতায় উনিশ শতকে গদ্যের আবির্ভাব যেন অবশম্ভাবী হয়ে ওঠে। কারণ পদ্যের তুলনায় গদ্যের আবেদন জনগণের নিকট সব সময় বেশি থাকে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন—'কবিতা গদ্যের তুলনায় কম সমাজমুখাপেক্ষী; কবিতা একা একা লেখা গেলেও যেতে পারে, গদ্য জনসমাগম চায়।'[১] এ প্রসঙ্গে নিচের উক্তিটিও গ্রহণীয়—

> 'কবিতায় যদি কোনো জাতির হৃদয়াবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ পায়, তবে গদ্যরচনায় প্রকাশ পায় তার মনস্বিতা, চিন্তাসামর্থ্য ও যুক্তিপূর্ণ জীবনদৃষ্টি। গদ্যরীতির বিশুদ্ধতর মূর্তি দেখা যায় প্রবন্ধে, যুক্তিধর্মী আলোচনায়। সেখানে মননশক্তির সুপ্রচুর চর্চা ও বিষয় প্রতিপাদনে লেখকের একাগ্র দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। কথা সাহিত্যে ও নাটকে গদ্যের যে রূপ দেখা যায়, তা আবেগধর্মী, অলংকৃত, বর্ণাঢ্য ও পাত্র পাত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। গদ্যের এই দুই রূপ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ দান করে'।[২]

আর এ কারণেই দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যগত পদ্যের বাইরে গদ্যের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করে তুললো; সঙ্গত কারণেই সমাদরে আদৃত হল সাহিত্যের এই নতুন ধারা। গদ্যের আগমনে বাংলা ব্যাকরণের অনুশাসনে কিছুটা পরিবর্তন এলো। লেখকের স্বাধীনতা বেড়ে গেল; ব্যাকরণের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ করে পদক্রমের ক্ষেত্রে এ স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হল বেশি। সাহিত্যবিচারে শৈলীর আলোচনায় ব্রতী হলেন শৈলীবিশারদগণ। তাঁরা শৈলী আলোচনায় ব্যক্তি শৈলীর পাশাপাশি অন্যান্য শৈলীরও গুরুত্ব দিলেন। গদ্য শৈলীর প্রসঙ্গ তাঁদের এই আলোচনারই ধারাবাহিক প্রয়াস মাত্র।

শৈলীর বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিষয় ভিত্তিক শৈলী অন্যতম। বিষয়ের কারণে লেখকের লেখার ধরন পৃথক হয়ে যায়। বিষয় বস্তুর ভিন্নতায় উপস্থাপন কৌশলও ভিন্ন হতে বাধ্য। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য তাই গড়ে উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাশৈলী (languagestyle)। বিষয়ভিত্তিক শৈলীকে আবার গদ্য শৈলী, পদ্য শৈলী, উপন্যাসের শৈলী, প্রবন্ধের শৈলী, ছোট গল্পের শৈলী প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা হয়। গদ্যের আবির্ভাবের পরে বিশেষত, উনিশ শতকের দিকে বাংলা সাহিত্যে এ শৈলীর আলাদা একটি কাঠামো গড়ে ওঠে। বাংলা গদ্যশৈলীর আলোচনা বর্তমানে তাই আবশ্যিকভাবেই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বাংলা গদ্যশৈলীর ধারাবাহিক বিবর্তন : বিতর্ক বাদ দিয়ে বলা যায়, বাংলা গদ্যশৈলীর উদ্ভব হয় উনিশ শতকে। বাংলা গদ্যের আবির্ভাব কালে বাংলায় চারটি গদ্যশৈলী বা গদ্যরীতির প্রচলন ছিল—পণ্ডিতি রীতি, আদালতী রীতি, চলিত রীতি ও সাহেবী রীতি। পণ্ডিতি রীতি বলতে সংস্কৃত শব্দবহুল গুরুগম্ভীর বাক্যগঠনকে বুঝানো হত। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা এ রীতি অনুসরণ করতেন। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার, তৎসম শব্দ বহুলতা, দীর্ঘ বাক্য ইত্যাদি ছিল এ রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। দৃষ্টান্ত—

> 'ধন্য ধন্য ধর্মবতার ধর্মপ্রর্বত্তক সৎ-প্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরেজ কোম্পানী বাহাদুর অধিক ধনী হওনের পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্মকার চর্ম্মকার চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কম্বা রাজের সমাজের কাঠের খাটের মাঠের সরদারী চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যাবাচন পরকীয়া রমণী সংগঠনকামি ভাঁড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্য তৎপর হইয়া কিম্বা পৌরহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরু—শিষ্যভাবে কিঞ্চিৎ অর্থ—সঙ্গতি করিয়া কোম্পানীর কাগজ কিম্বা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতম দিবাবসানে অধিকতর ধন্যাঢ্য হইয়াছেন। (নববাবু বিলাস, ভবানীচরণ)

গদ্যের একটি প্রধান কাজ হচ্ছে সমাজের ছবিকে পরিস্ফুট করা। সেই ছবি অঙ্কনের মাধ্যমে ভবানীচরণ সমাজের সমালোচনার দিকটিও তুলে ধরেছেন। নববাবু বিলাসের শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাসে আলাদা ধরনের নির্মিতি লক্ষ করা যায়। তাঁর এ লেখায় যতি চিহ্নের ব্যবহার নেই বললেই চলে। সমাজের বিশৃঙ্খল আচরণের সঙ্গে ভাষাও যেন একাকার হয়ে গেছে। ফলে একটি স্বতন্ত্র ধারার শৈলী তাঁর রচনায় লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকের অনেকের লেখায় এরূপ শৈলীর (পণ্ডিতি শৈলী) ব্যবহার পাওয়া যায়।

অফিস আদালতে আশ্রিত রীতিকে বলা হত আদালতী রীতি। 'অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের আগমনের ফলে ব্যবসাবাণিজ্য, বস্ত্রশিল্প, ও কোম্পানি

কার্যক্রমের সঙ্গে এই রীতি সংশ্লিষ্ট ছিল। ফারসী শব্দের ব্যবহার এই রীতিতে অধিক। ভারতচন্দ্রের রচনায় ফারসী শব্দের ব্যবহারও একই বাস্তবতার স্বীকরণ। আদালতী রীতির বাক্যবন্ধ শ্লথ কিন্তু বিষয়গত শব্দব্যবহার সুনির্দিষ্ট।[৭] '১৮৩৫ সালের দিকে ফারসীর পরিবর্তে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ইংরেজীর প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু ততদিনে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাষা হিসেবে ফারসি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল বাঙালীর ভাষাতেই এমন ভাবে অনুপ্রবেশ করে যে, রাজভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রবর্তন হওয়া সত্ত্বেও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মুখের ভাষাতেও আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যথেচ্ছভাবে। তার সমর্থন পাওয়া যায় ১৮০২ সালে প্রকাশিত রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে', তার অব্যবহিত পরের রাজা রামমোহন রায়ের রচনাবলীতে, ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' এ এবং ১৮৬২ সালে প্রকাশিত কালী প্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নকশা'য়। দৃষ্টান্ত—

'হিন্দুর **লেড়কা** হ'য়ে **হেন্দুর মাফিক** পালাপর্বন করা **মোনাসেব**, আর দুনিয়াদারী করতে গেলে **ভালাবুরা** চাই **দুনিয়া** সাচ্চা নয় মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করবো?

ঠক চাচার কথা শুনে বাহুল্য বললো, **দোস্ত**, ওসব **বাৎ** দেল থেকে **ওফাৎ** কর-**দুনিয়াদারি মুসাফিরি সেরেফর আনা** যানা কোই **কিসিকো নেহি** তোমার এক **কবিলা**, মোর চেট্টে, সব জাহান্নাম মে ডাল দেও, **আবি** মোদের কি **ফিকিরে** বেহতর হয় তার **তদ্বির** দেখ।' (আলালের ঘরের দুলাল, প্যারীচাঁদ মিত্র, ১৭৫৮)

উপরের দৃষ্টান্তে মোটা হরফের লেখাগুলি আরবি-ফারসি শব্দের দৃষ্টান্ত। ঠক চাচা সেকালের কলকাতার মুসলিম সমাজের এমন প্রতিনিধি যাঁরা তাঁদের ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার করতেন অবলীলায়।

মাইকেল ওয়েস্ট চলিত রীতিকে 'The Popular dialect of Bengal' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ শৈলীর বাক্য সংক্ষিপ্ত, শব্দ প্রচলিত, ক্রিয়াপদগুলো কেজো, অর্থ স্পষ্ট। ১৯১৪ সালে সবুজপত্র পত্রিকার মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরী এ শৈলীর প্রচলন করেন। এর পর থেকে চলিত রীতির সর্বত্র ব্যবহার লক্ষ করা যায়। দৃষ্টান্ত—

> তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া? অবশ্যই নয়। কেননা কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল না বন্ধ হলে যে খেলার সময় আসে না, এতো সকলেরই জানার কথা। কিন্তু সাহিত্য রচনা যে আত্মার লীলা, একথা শিক্ষকের স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্মকর্ম যে এক নয়, এ সত্যটি একটু করে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। প্রথমত, শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য

হয়, অপরপক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে পান করে; কেননা শাস্ত্র মতে সে রস অমৃত। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো, শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো; কাব্য যে সংবাদপত্র নয়, একথা সকলেই জানেন। তৃতীয়ত, অপরের মনের অভাব পূরণ করবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষকের হস্তে শিক্ষালাভ করছে, কিন্তু কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যে উৎপত্তি। (সাহিত্যে খেলা, প্রমথ চৌধুরী, পৃ. ২৬-২৭)।

সাহেব বা বাবুদের কথাবার্তা ও লেখার ধরনকে বলা হয়ে থাকে সাহেবী রীতি। 'মধুসূদনের একেই কি বলে সভ্যতায় একজন পুলিশ সারজনের সংলাপ আছে, তার ভাষারীতিকে সাহেবী রীতির দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যায়।[৮]

বাংলা গদ্যের প্রামাণিক যুগের সূত্রপাত হয় ১৭৪৩ সালে। এ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে প্রথম বাংলা গদ্য গ্রন্থ প্রকাশ করে পোর্তগীজ পাদ্রি মনো এল দ্য আসসুম্পসাউঁ এক নতুন ইতিহাসের সারথি হলেন। '১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দের পর বাংলা গদ্যের ইতিহাসে স্মরণীয় বছর ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দ। এই বছরে হুগলি শহরে ছেনি-কাটা বাংলা হরফে বাংলা গ্রন্থ মুদ্রণ আরম্ভ হয়। প্রথম বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ('এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গয়েজ'), লেখক নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড। তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এর অনুরোধে বিখ্যাত সংকৃতজ্ঞ পণ্ডিত চার্লস উইলকিন্স পঞ্চানন কর্মকারের সাহায্যে ছেনি—কাটা ছাঁচে ধাতুদ্রব্য ঢালাই করা হরফ প্রস্তুত করেন। সেই হরফে হালহাডের ব্যাকরণ মুদ্রিত হয় (১৭৭৮)।[৯] দুবছর পর অর্থাৎ ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে জেমস অগাস্টাস হিকি তাঁর 'বেঙ্গল গেজেট' মুদ্রণের জন্য কলকাতায় সর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন, আর ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস গ্লাডউইন 'দি ক্যালকাটা গেজেট' প্রেস স্থাপন করেন। এর ফলে শুরু হলো বাংলা গদ্যের নবযুগ, নব স্টাইল। ১৭৭৮-১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা গদ্যের নেপথ্য পর্বে অভিধান, ব্যাকরণ ও শব্দ সংকলন প্রণয়ন দ্বারা বাংলা গদ্যভাষার ভিত্তি দৃঢ় হয়। এ সময়ের বাংলা গদ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো অনুবাদ সাহিত্যেকর্ম এবং এ সব সাহিত্যে শব্দবন্ধ বা বাক্যাংশের অনুবাদ, মূল টেক্সটের কোন কোন অংশ বর্জনের মাধ্যমে অনুবাদ, আরবি ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহার প্রভৃতি।

'প্রাচীন যুগে বাংলা সাহিত্যে গদ্যের প্রচলন ছিল না। মধ্য যুগের শেষের দিকে কিছু দলিল দস্তাবেজ ও দু'একটি গদ্য সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া গেলেও তা বাংলা গদ্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসেবে গৃহীত হয়নি, তা গণ্য করা হয়েছে বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে। 'কারণ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে রচিত বাংলা গদ্যেরও কিছু কিছু নমুনা পাওয়া গেছে।[১০] এসব গ্রন্থ ও নিদর্শনের তাই ঐতিহাসিক মূল্য আছে বটে; আর সাহিত্যিক মূল্য নিয়ে নির্দ্বিধায়

কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর। বাংলা গদ্যের সূচনা হয় উনিশ শতকে-ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন—

> 'আসলে বাংলা গদ্যের শুরু উনবিংশ শতাব্দীতে; তার আগে দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রের ভাষা ছিল, কিন্তু সত্যিকার গদ্য ছিল না। শুরুতে শব্দ ছিল, এবং সেই সঙ্গে লিখিত না হোক অলিখিত এক ধরনের ব্যাকরণও ছিল বৈকি। গদ্যের শব্দসম্পদ ক্রমশ বেড়েছে, ব্যাকরণের শৃঙ্খলা সেই সঙ্গে স্পষ্টতর হয়েছে। পেছনে ছিল সমাজ; একদিকে শব্দ, শব্দের সঙ্গে শব্দের অন্বয়, বাক্যের গঠন, তার ছন্দস্পন্দন ; অন্যদিকে শব্দ ব্যবহারকারীর অর্থাৎ লেখকের মন ও মানসিকতা, চিন্তা ও চেতনা, অনুভব, অভিজ্ঞতা, এমনকি কল্পনা সমস্ত কিছুর পেছনে সমাজ কাজ করে গেছে—গোপনে তো বটেই, প্রকাশ্যেও।[১১]

উনিশ শতকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক জীবনে দু'টি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে—একটি শ্রীরামপুর ব্যাপিস্ট মিশনের পত্তন (১০ জানুয়ারি, ১৮০০), অন্যটি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা (৪ মে, ১৮০০)। 'ইংরেজ কর্মচারীদের এ দেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮০০ সালের ৪ মে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।'[১২] গভর্নর লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এ কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয় ১৮০১ সালে। উইলিয়াম কেরি শুরুতে এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। বিলাত থেকে আগত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের সংস্কৃত, বাংলা, ব্রজভাষা, হিন্দুস্থানি, অর্থাৎ উর্দু ও হিন্দি এবং আরবি ও ফারসি প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় ভাষা শেখানোর জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় বাংলা, উর্দু ও হিন্দিতে গদ্য রচনার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। 'কলেজের শিক্ষক ও প্রাক্তন বিদ্বান ব্যক্তিগণ বাংলাসহ ভারতের প্রায় সকল ভাষার সংস্কার ও আধুনিকায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। কলেজের বাঙালি শিক্ষকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন রামরাম বসু, তারিণীচরণ মিত্র, ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। এ সকল পণ্ডিতের সাহায্যে কলেজের অধ্যাপকগণ বাংলা ভাষার মান উন্নয়ন ও বাংলা গদ্য রীতির প্রবর্তনের কাজে সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেন।[১৩] ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের সূচনায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে কেরী সম্পাদিত বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পর লর্ড ওয়েলেসলি তাঁর প্রতি নজর দেন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগ খুলে তার হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। কেরি রচিত 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' বাংলা গদ্যচর্চার পথকে সুগম করেছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যেই এ গ্রন্থের পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত

হয় ১৮০১, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৫, তৃতীয় সংস্করণ ১৮১৫, চতুর্থ সংস্করণ ১৮১৮ ও পঞ্চম সংস্করণ ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কেরির দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ডায়ালোগস' বা 'কথোপকথন'। গ্রন্থটি বাংলা ফ্রেজ ও ইডিয়ম সম্পর্কে রচিত প্রথম গ্রন্থ। কলকাতা—শ্রীরামপুর অঞ্চলের মৌখিক ভাষার কথোপকথনের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ঐ ভাষাই পরবর্তীকালে সাহিত্যিক চলতি বাংলা গদ্যের আদর্শ রূপে স্বীকৃত হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মৌখিক রূপের ভাষাকে এখানে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে-ঘাটের কথা, রায়তের কথা, মজুরির কথা, হাটের কথা, জেলেনির কথা প্রভৃতি তার প্রমাণ। এসব কথাবার্তা কেরি তাঁর গ্রন্থে অত্যন্ত সুন্দর, সহজ, সরল ও সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বলা হয়ে থাকে—

> 'কেরির গদ্যরচনা আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রস্তুতিকালের প্রথম মাইলস্টোন। ব্যাকরণ অভিধান প্রণয়ন, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও হিন্দু জনসাধারণের নিকট খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য সহজবোধ্য ভাষায় প্রচার—এই তিন ঘটনার যোগাযোগে কেরী যে বাংলা গদ্য লিখলেন, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য—পূর্ববর্তী আরবী-ফারসীর প্রভাবমুক্তি (দলিল-দস্তাবেজের প্রভাব থেকে মুক্তি) ও সংস্কৃত আদর্শের অনুসরণ।[১৪]

শ্রীরামপুরে কেরী এবং তাঁর সহকারীবৃন্দ যেমন টমাস, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করেন। এসব অনুবাদে ইংরেজি ভাষার স্টাইল প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু একমাত্র উইলিয়াম কেরিই ইংরেজি বাকরীতি ছেড়ে সংস্কৃত শৈলীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাঁর এ পথ অনুসরণ করলেন রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়, গোলকনাথ শর্মা, চণ্ডীচরণ মুন্সি, তারিণীচরণ মিত্র, হরপ্রসাদ রায় প্রমুখ। কেরির রচনায় বাংলা শৈলীর যথার্থ রূপ প্রকাশিত হয়নি। শব্দনির্বাচনে ও সন্নিবেশে অপটুতা, সাধু ভাষায় গদ্য রচনা প্রভৃতি তাঁর গদ্য রচনার প্রধান ত্রুটি। সাধু ভাষার সমর্থনে তাঁর নিচের উক্তিটি গ্রহণীয়—

> Indeed there are two distinct languages spoken all over the country, viz the Bengali spoken by the Brahmins and lighter Hindus, and the Hindustani, spoken by the mussalmans and lower Hindus, which is a mixture of Bengali and Persian.[১৫]

এই গোষ্ঠীর প্রধান লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনাতে গদ্য ব্যবহারে স্বচ্ছতা, কুশলতা ও নতুনত্বের আভাষ পাওয়া যায়। বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলি, বেদান্তচন্দ্রিকা, প্রবোধরচনা তাঁর সার্থক রচনা। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি

সংস্কৃত ভাষার অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। উইলিয়াম কেরীকে তিনি সংস্কৃত ও বাংলা শিখিয়েছিলেন। ভাষাজ্ঞান তাঁকে অনন্য উচ্চতায় সম্মানিত করেছিল। 'সংস্কৃতে অনায়াস অধিকারের ফলে তিনি দুরূহ শাস্ত্রবিচারকে আয়ত্ত করেছিলেন এবং সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র ও কাব্যে অশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। ফলে গদ্যরীতি (স্টাইল) সম্পর্কে তাঁর শিল্পীমন সচেতন হয়ে উঠেছিল। [১৬] এর পর বাংলা গদ্য সাহিত্যে নতুন শৈলীর প্রবর্তন করেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৮৩)। তাঁর কালের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তিনি। ম্যাক্সমুলার তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—'a great man, because of unselfishness, honesty and boldness.'[১৭] রামমোহনের হাত ধরে বাংলা গদ্য এগিয়ে গেল। গদ্যে তিনি অন্বয় আনলেন। রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য প্রবন্ধে লিখেছেন 'পূর্বে কেবল ভাবুক সভার জন্য পদ্য ছিল, এখন জনসভার জন্য গদ্যের অবতীর্ণ হইল।... রামমোহন রায় আসিয়া সেই আমদরবারের সিংহদ্বার স্বহস্তে উদঘাটিত করিয়া দিলেন।' রামমোহনের গদ্য ছিল সাধু গদ্য। সাধু ও চলিতের পার্থক্য রামমোহনই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সাধু ভাষাপ্রীতির কারণ ছিল সংস্কৃতের অনুরাগ থেকে। তিনি লিখেছেন—'এ ভাষা সংস্কৃতে যে-রূপ অধীন হয় অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে'। (বেদান্ত, অনুষ্ঠান)। গদ্যে তিনি যুক্তির প্রয়োগ দেখালেন। তিনি উপনিষদ অনুবাদ করে বাংলা গদ্যের বহন ক্ষমতার পরীক্ষা করেন এবং বাংলা গদ্যে দার্শনিক চিন্তা লিপিবদ্ধ করে গদ্যের সহনশীলতা বৃদ্ধি করেন। তিনি ১৮২৬ সালে 'Bengali Grammar in the English Language' নামে ইংরেজিতে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। তিনি ছিলেন বহুভাষা জ্ঞানের পণ্ডিত এবং সাধারণ তুলনাত্মকবোধের অধিকারী। তিনি ছন্দ, বচন, লিঙ্গ, পুরুষ, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, বাক্যের বিভিন্ন পদের সার্থক অন্বয় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বিতর্ক বাদ দিলে দেশীয়দের দ্বারা যথার্থ বাঙলা ব্যাকরণ রাজা রামমোহনের হাতেই এবং ১৮৩৩ সালে সৃষ্টি হয়।[১৮] 'বাংলা ভাষার স্বভাব যে সংস্কৃত অথবা ইংরেজি ভাষার স্বভাব অপেক্ষা স্বতন্ত্র সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন ঠিকই, কিন্তু সে চিন্তার প্রাথমিক উদগাতা রামমোহন। এ কথা সত্য রামমোহন সর্বদা সেই চিন্তার প্রয়োগ তাঁর ভাষায় করতে পারেননি, কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। আর এখানেই বাংলা গদ্যের বিকাশের ইতিহাসে তাঁর অবদান।[১৯] বাংলা গদ্য শৈলীর বিবর্তনে অন্য নাম ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত। 'তাঁর সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১) পত্রিকায় যে ভাষার চর্চা হয়েছিল, তা সাংবাদিকদের ভাষা। গদ্যের জড়তামুক্তি ও সাংবাদিকসুলভ হাল্কা চালের বাক্য গঠনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কৃতিত্ব অবশ্যস্বীকার্য। এই ভাষাকে বলা যায় আটপৌরে ভাষা,—কেরীর 'কথোপকথনে' ও ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাসে' যার

পত্তন, এখানে তারই প্রতিষ্ঠা।[২০] মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায় প্রমুখের গদ্যের শৈলীতে প্রধান ত্রুটি ছিল—যথার্থ শব্দ নির্বাচনে অপটুতা, শব্দ প্রয়োগে সঠিক জ্ঞানের অভাব, বাক্যাংশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ না থাকা, সমগ্র বাক্যের ভারসাম্য রক্ষিত না হওয়া ইত্যাদি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে এসব সীমাবদ্ধতা দূর হল। 'বিদ্যাসাগর বাঙালীকে শোনালেন প্রকৃত গদ্যের নিজস্ব ছন্দ বা তাল, দেখালেন তার লালিত্য ও নমনীয়তা, নিয়ে এলেন যতিচিহ্নিত গদ্যে বাক্যগঠন—রীতির সৌষম্য ও ছন্দ স্রোত।[২১] ভাষাকে তিনি অনেক বেশি বেগবান, সুষমাময়, সৌম্য ও সরল করেছেন। বাংলা সাহিত্যিক পদ্যের সূচনা হয় তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩) পত্রিকার মাধ্যমে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রধান সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই গোষ্ঠীর প্রধান লেখক। বিদ্যাসাগর পণ্ডিতি রীতি ও বিষয়ী রীতি, কথ্যরীতি ও সংস্কৃত রীতির মধ্যে মিলন ও বিরোধ ইত্যাদির পরে প্রচলন করেন মধ্যগা রীতি। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী'। 'উনিশ শতকের মানবতাবাদের যেমন বাংলা গদ্যের সার্থক শিল্পরূপ নির্মাণের ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। রামমোহন বাংলা গদ্যেও কাঠামো তৈরি করেন, আর বিদ্যাসাগর তাতে প্রাণসঞ্চার ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন। বিদ্যাসাগরের রচনাকে চারটি ধারায় ভাগ করা যায় : সমাজবিষয়ক রচনা, রম্যরচনা, পাঠ্যপুস্তক, ও সাহিত্যধর্মী রচনা। তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য বাংলা গদ্যে সাবলীল গতিভঙ্গি তথা অন্তর্নিহিত ছন্দ আবিষ্কার এবং বিরামচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার। উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের প্রধান পরিকল্পনাকারী ও নিয়ন্ত্রক ছিলেন বিদ্যাসাগর। তিনি বাংলা সাধুগদ্যের একটা আদর্শ রূপ দেন, যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালের লেখকগণ অনুপম সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।[২২] বাংলা গদ্যশৈলী বিকাশ পর্বে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আগমন। তিনি বাংলা গদ্যকে সর্ব প্রকার ভাব প্রকাশের উপযোগী করে তোলেন। তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভা গুণে পণ্ডিতির ও আলালি—হুতোমি শৈলীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সরস ও সরল গদ্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতির ভিত্তিভূমি গড়ে উঠল বঙ্কিমী গদ্য রীতিতে। গদ্যের ভারসাম্য অর্জন, শেষ লক্ষ্য সরলতা ও স্পষ্টতা অর্জন। স্পষ্টতা ও সরলতা মিলে ভাষারীতির পূর্ণতা পাওয়া যায় বঙ্কিমী রীতিতে। তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকায় এ রীতি বা শৈলীর সাবলীল প্রকাশ লক্ষণীয়। শব্দ, ক্রিয়া পদ, বিশেষণ, অলঙ্কার ও অনুচ্ছেদ, ব্যবহারে তিনি নিজস্ব শৈলীর উদ্ভাবন করেন। তিনি কথাসাহিত্যে ও প্রবন্ধ সাহিত্যে দু'টি ভিন্ন রীতি ব্যবহার করেছেন। বাংলা সাহিত্যের পরিণত যুগে মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত হন। তাঁর আগে

বাংলা গদ্যে উল্লেখযোগ্য কোন মুসলমান সাহিত্যসেবী ছিলন না। বাঙ্গালি মুসলমান সাহিত্যসেবীরা তখন পুঁথি সাহিত্য রচনায় নিয়োজিত ছিলেন।এমন সময় সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতকে স্বীকার করে নিয়েই পরিণত প্রতিভাবাপন্নসম্পন্ন মীর মোশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্য আসরে নামলেন। তিনি একাধারে কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্দ, রসরচনা, নাটক, ও প্রহসন মিলিয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশটি গ্রন্থ লেখেন। তাঁর বিখ্যাত রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—বিষাদ সিন্ধু, জমিদার দর্পণ, উদাসীন পথিকের মনের কথা, বসন্তকুমারী নাটক, গাজীমিয়াঁর বস্তানী, এসলামের জয়, বাজীমাত ইত্যাদি। তাঁর রচনার বিশেষত্ব হলো সহজ, সরল ভাষায় কঠিন বিষয়কে উপস্থাপন। তিনি সাবলীল শৈলী প্রয়োগ করেছেন তাঁর লেখায়। ফলে ভাবের গূঢ় বিষয় লেখার মধ্যে আশ্রিত হলেও তাতে শব্দের ব্যবহার ও শব্দগঠনে কোন প্রভাব পড়েনি। সমালোচকগণ মনে করেন যে, তাঁর লেখার প্রধান ক্রটি হচ্ছে বাকবাহুল্য এবং সমন্বয়হীনতা। আবার কেউ কেউ বিষয়দ্বয়কে শিল্পের শৈল্পিক গুণ হিসেবে গণ্য করেছেন। আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে সত্যিই ভিন্নধর্মী শৈলী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি যে সমন্বয়ধর্মী ও স্বাতন্ত্রধর্মী সাহিত্য উদ্বোধন করেছিলেন তা কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, এস ওয়াজেদ আলী, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ সাহিত্যিক এবং তাঁদের অনুসারীদের মাধ্যমে আজও মুসলিম সাহিত্যের সে ধারা অব্যাহত রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে পরিচিত প্যারিচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল এ সময়ের সৃষ্টি। আলালী গদ্যের বৈশিষ্টের মধ্যে প্রধান হলো—সাধু ভাষার ক্রিয়াপদের পরিবর্তে চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের ব্যবহার, তদ্ভব ও দেশি শব্দের বহুল প্রয়োগ, সমাসযুক্ত পদ পরিহার, ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ, কথ্যভাষার বাক্যাংশের ব্যবহার, প্রবাদ প্রবচনের প্রয়োগ প্রভৃতি। আলালী গদ্য সম্পর্কে নিচের উক্তিদ্বয় স্মর্তব্য—

> 'ইয়ং বেঙ্গল প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট ধারা প্রবর্তনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেন ইয়ং বেঙ্গল সদস্যরা। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তাঁরা ছিলেন প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কারের বিরোধী। তাঁরা নির্বিচারে কোন কিছু গ্রহণ করতেন না। তাঁদের চিন্তা ও কর্ম তখনকার (১৮৩১-১৮৫৭) বাঙালি সমাজকে গভীরভবে প্রভাবিত করে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। প্যারিচাঁদ মিত্রের নাম এ ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। 'টেকচাঁদ ' ছদ্মনামে নামে রচিত তাঁর আলালের ঘরের দুলাল বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস। এতে তিনি আরবি-ফারসি-হিন্দুস্থানি মিশ্রিত সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহার করেন।

ভাষাগত কারণেও উপন্যাসটি সমকালে এবং পরবর্তীকালে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে। তাঁর অন্যান্য রচনায়ও ভাষা ব্যবহারের এই স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান, যে কারণে বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে 'আলালি গদ্য' নামে তাঁর ভাষাকে পৃথক মর্যাদা দেওয়া হয়।[২৩]

১৮৩৭ সাল পর্যন্ত ফার্সী যেহেতু ছিল রাজদরবারের ভাষা তাই কথাবর্তায় ভাষায় আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহারের প্রচলন ছিল। ইংরেজ রাজত্বে ফার্সির জায়গা দখল করে নিল ইংরেজি এবং সংস্কৃত পণ্ডিতদের সফল কর্মতৎপরতাও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহযোগিতায়—লিখিত বাংলা থেকে আরবি-ফার্সি শব্দের বিতারণের একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া শুরু হলো। '... অবারিত ইংরেজী শব্দের আগমনে আবার বাঙলা ভাষা বাঙালী জনগণের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠলো। ফলে রাজনারায়ণ বসুর সেই বহুকথিত বাক্য আমরা বাঙলায় পাই:

> আমার father কিছু unwell হওয়াতে doctor কে call করা গেল, তিনি একটি physic দিরেন। physic বেশ operate করেছিল four times motion হলো, অদ্য কিছু better বোধ করেছেন।'[২৪] 'ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এবং ব্যবসায়সূত্রে ওলন্দাজ, ফরাসি, দিনেমার ইত্যাদি পাশ্চাত্য জাতিদের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়ার ফলে প্রচুর ইংরেজি এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষার শব্দ নির্বিবাদে বাংলাতে গৃহীত হতে থাকে। আইন—আদালতের কাজে ফারসী শব্দের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমতে থাকে। সে জায়গায় ইংরেজী শব্দ আস্তে আস্তে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ইংরেজী বাকভঙ্গি ও এই সময় বাংলায় অনেকটা গৃহীত হয়ে যায়। এর কারণ রাজকার্যের এবং উচ্চশিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজীর ব্যাপক প্রতিষ্ঠা।[২৫]

'আলালের লেখক এই কাণ্ডে যোগ দেন নি, তিনি বরঞ্চ আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করে কোন কোন চরিত্রের জন্য চমৎকার জীবনঘনিষ্ঠতা তৈরি করে নিলেন।[২৬] ভাষার ব্যাপারে কালী প্রসন্ন সিংহ প্যারীচাঁদ মিত্রকে ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁর লেখায় খাঁটির কলকাতার উপভাষার ছাপ পাওয়া যায়। এ ভাষার প্রধান গুণ হলো সরসতা, লঘুতা ও অদম্য প্রাণশক্তি। 'হুতোম প্যাচার নকশায়' তিনি কথ্য ভাষার সঙ্গে গালাগালির ভাষাকে যোগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ ভাষাকে অশালীনতা ও শব্দ-দারিদ্র্য বলে আখ্যায়িত করেন। তবে গভীর পর্যবেক্ষণে এ কথা স্বীকার্য যে, আলালী বাংলার চাইতে হুতোমী বাংলার ভাষারীতি অত্যন্ত সাবলীল ও দেশজ শব্দের ব্যবহারে সার্থকতা বেশি। তিনি কথ্য ও সাধু উভয় ভাষারই চর্চা করেছেন। বাংলা গদ্যশৈলীর বিকাশ পর্বে প্রবন্ধ রচনার ধারা উল্লেখ করার মত। এ ধারার সূত্রপাত হয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাতে এবং পরিণতি লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মননশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে ছিলেন অনন্য, এমনকি তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধও ছিল সে সময়ের জন্য অভাবিত। উনিশ শতকের শেষ দশকে বাংলা ভাষা বিশ্লেষণে যে একটি নতুন ধারার সূত্রপাত হয়, তিনি ছিলেন তার সূচনাকারী। 'বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত গ্রন্থসকালে এক নূতন বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাহা একদিকে বিদ্যাসাগরী বা অক্ষয়ী ভাষা, অপরদিকে আলালী ভাষার মধ্যগা।[২৭]

বঙ্কিমের পর বাংলা গদ্য সাহিত্যে নব শৈলীর সূচনা করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাধু ও চলিত গদ্যের চরম ঐশ্বর্য তাঁর গদ্যে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষা ও গদ্যরীতির বিবর্তন নিয়ে তিনি সারা জীবন ভেবেছেন। ১৮৮৫-১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি যে নানা বক্তব্য ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তা তাঁর শব্দতত্ত্ব ও বাংলা ভাষা নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর গদ্যশৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ক্রিয়াপদের বিরলতা ও সংকোচন, সংক্ষিপ্ততা, স্বল্পাক্ষরতা প্রভৃতি। বাংলা গদ্য ভাষার নিজস্বতা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। বাংলা ভাষার উদ্ভব স্থল সংস্কৃত অপেক্ষা তিনি প্রাকৃতকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি তৎসম শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে দেশি, বিদেশি, আরবি, ফারসি ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করেছেন। তিনি বঙ্কিমী আবহে গদ্য রচনা শুরু করলেও তা আপন ধারায় গতি সঞ্চারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। নিচের উক্তিতে সেই উক্তিটিই সমর্থিত হয়েছে—

> 'রবীন্দ্রনাথ এই গদ্যরীতির আবহাওয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নিতান্ত অল্প বয়সেই তাঁর গদ্যরীতি ও প্রবন্ধরীতিতে স্বকীয়তা দেখা গেল। ব্যবহারিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার পথ ছেড়ে তিনি ব্যক্তিগত অনুভূতির পথে গেলেন, বিষয়প্রাধ্যান্য অগ্রাহ্য করে বিষয়ীপ্রাধান্যের দিকে ঝুঁকলেন, আত্মনিরপেক্ষতা ছেড়ে আত্মভাবনাকে আশ্রয় করলেন। তার ফলে কৈশোরের শেষ ধাপ পেরোবার আগেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমী গদ্যরীতি ছেড়ে আপন গদ্যরীতি আবিষ্কারে আগ্রহী হলেন। পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর বাংলা গদ্য-স্টাইল রবীন্দ্র-স্টাইলের পটভূমি থেকে পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধি আহরণ করেছে।'[২৮]

রবীন্দ্রযুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৩৮)। ভাষায় আবেগ সঞ্চারে এবং বাংলা গদ্যশৈলীর ক্রমবিকাশে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর হাতে বাংলা গদ্যশৈলী বিশিষ্টতা লাভ করে। তিনি ১৯১৪ সালে সবুজপত্র পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা চলিত রীতির প্রবর্তন করেন। তাঁর গদ্যশৈলীর একটি স্বতন্ত্র ধারা স্বল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। তাঁর প্রবন্ধ এবং ভাষাভঙ্গি পরবর্তী একটির গোষ্ঠীর

উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বাংলায় ফরাসি ছোটগল্পের আঙ্গিক শৈলীকে তিনিই প্রথম পরিচিত করে তোলেন। 'প্রমথ চৌধুরীর কাজ এবং রবীন্দ্রনাথের সমর্থন বাঙলা ভাষার অবয়ব পরিকল্পনাকে সজীবতা দান করেছিলো।[২৯] এরপর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও মোহিত লাল মজুমদারের বাংলা গদ্যশৈলীর ধারা বিকশিত হওয়ার পর বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবে বাংলা গদ্যশৈলী স্বাতন্ত্র্য মহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে বর্তমান অবধি রবীন্দ্র-নজরুলের ভাষাশৈলীর অবাধ অনুকরণ লক্ষণীয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, আক্তারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, আলাউদ্দীন আল আজাদ প্রমুখের হাত ধরে বাংলা গদ্যশৈলীর নিরন্তর পথযাত্রা আজও অব্যাহত।

বিশ শতকের অন্বিষ্ট সাধনা বাংলা গদ্য শৈলীর বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে। সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', প্রমথ নাথ বিশীর 'বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক' প্রভৃতি রচনায় শৈলীগত পর্যবেক্ষণের অনুসন্ধিৎসা লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'উপসর্গের অর্থবিচার', রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' প্রভৃতি রচনার উজ্জ্বল অন্তর্দৃষ্টির কথা। বাংলা গদ্যের আলোচনায় শৈলীবিজ্ঞানের প্রথম এবং সার্থক বিবেচনা লক্ষ করা যায় শিশির কুমার দাশের 'Early Bengali prose : from cary to Vidyasagar' গ্রন্থে। তাঁর রচনায় শৈলীমিতির সুনির্দিষ্ট ব্যবহার রয়েছে। 'তিনি এই গ্রন্থে শৈলীবিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণে উইলিয়াম কেরি থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বাংলা গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য বিষয়ে মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।[৩০] পরবর্তী সময়ে অক্ষয় কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় বাংলা গদ্যশৈলী সমৃদ্ধ হয়েছে। এছাড়া অপূর্ব কুমার রায়ের 'উনিশ শতকের বাঙলা গদ্য সাহিত্য : ইংরেজি প্রভাব ও 'বাঙলা গদ্যচর্চ : বিদ্যাসাগর গোষ্ঠী, অরুণকুমার বসু সম্পাদিত 'বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা', আশিস কুমার দে'র 'উপন্যাসের শৈলী' পবিত্র সরকারের 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি', অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস', ভূদেব ঘোষের 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও বাংলা গদ্যভাষা' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা গদ্যশৈলীর বিকাশের পথকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

উপসংহার : বাংলা গদ্যশৈলী বিকাশের সূচনা উনিশ শতকের পূর্বে হলেও এ শতকেই এর বিকাশের উৎকর্ষ প্রতিভাত হয়। ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও প্রতিষ্ঠান এ উদ্যোগের সারথি হয়ে বাংলা গদ্যশৈলীর বিবর্তনকে বেগবান করে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাংলা গদ্যশৈলীর শত ধারা দিনের পর দিন বিকশিত হচ্ছে। বাংলা গদ্যশৈলীর ছোঁয়া লেগেছে ভাষাবিজ্ঞানের

ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান শাখায়ও। সঙ্গত কারণেই ভাষাবিজ্ঞানী, সাহিত্যবোদ্ধা, সাহিত্যসমালোচক, শৈলীবিশারদ প্রমুখ বাংলা গদ্যশৈলীর দিগন্ত উন্মোচনে আরও সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁরা কেবল সাহিত্যের শরীর নয়, সাহিত্যের অন্তর্নিত তাৎপর্য আবিষ্কারের পাশাপাশি সাহিত্যিকের মনন বিশ্লেষণ, তাঁর লেখার পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব, লেখার চিহ্নতাত্ত্বিক অনুধাবন কৌশল প্রভৃতি বিষয়ও সমভাবে তাঁরা গুরুত্ব দিয়ে আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। মোট কথা, বাংলা গদ্যশৈলীর বিচিত্র রূপের অনুসন্ধান বর্তমানে এ ধারাকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে।

তথ্য-নির্দেশ

১. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ২০০৩, *উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, পৃ. ১২

২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৭, *বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩৩

৭. মনসুর মুসা, ১৯৯৫, *বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৪০

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৯. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

১০. পরেশচন্দ্র মজুমদার, ১৩৮৩, *বাঙলা ভাষা পরিক্রমা—প্রথম খণ্ড*, কলিকাতা : স্বারস্বত লাইব্রেরী, পৃ. ৯৯

১১. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১২. সৌরভ সিকদার, ২০০৩, *সংক্ষিপ্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকোষ*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ১৮৪

১৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া, ২০০৩, খণ্ড-৮*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ২১৮

১৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

১৫. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ২০০৮, *নির্বাচিত সাহিত্যসমালোচনা*, ঢাকা : মৌলি প্রকাশনী, পৃ. ৯৫

১৬. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

১৭. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ২০০৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১৮. মনিরুজ্জামান, বাঙালীর ব্যাকরণ চিন্তা, মনসুর মুসা (সম্পাদিত), ১৯৯৪, *বাঙালীর বাঙলাভাষা চিন্তা*, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, পৃ. ৬১

১৯. নবেন্দু সেন, ১৯৮৮, *বাংলা গদ্য স্টাইলিসটিকস*, কলকাতা : মহাদিগন্ত, পৃ. ৪৭

২০. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

২১. পরেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

২২. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮